গৃহশান্তির সহজ উপায়

গৌতমকুমার পাল

কলিযুগ কলহের যুগ। এযুগে গৃহশান্তি নয়, গৃহযুদ্ধই হল "ঘর ঘর কি কাহানি"। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের, ভাই-বোনের সঙ্গে ভাই-বোনের, শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর বাগবিতণ্ডা নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। ঘরের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জন্য বিষয়ের অন্ত নেই। আপাতদৃষ্টিতে কোনও সমস্যা না থাকলেও মানুষের বিষাক্ত মন ঝগড়ার অজুহাত বের করতে ওস্তাদ।

সংসারে ঝগড়াঝাঁটির একটি মূল কারণ হল অহং। প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর অহংবোধ বর্তমান। অহং-এ অন্ধ হলে মানুষের মনে হয়, আমি যা করছি সেটাই ঠিক – সে তখন আর আগু-পিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন মনে করে না। বয়সে ছোট বা অভিজ্ঞতা কম যাদের, তারা অহং-এর বশবর্তী হয়ে মনে করে যে বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞান যুগোপযোগী নয়। আর বয়সে বড়রা অহং-বিদ্ধ হয়ে ভুলে যান যে বিপরীত পক্ষ বয়সে ছোট হলেও কখনও-কখনও তাদের কথায় সারবত্তা থাকতে পারে। অহং-অন্ধ মানুষ অন্যকে অপমান করতে গিয়ে নিজেরই সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয় – চক্ষুলজ্জাটুকুকেও বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না।

সংসারে অশান্তির আর একটি কারণ লোভ। বাবা-মার সম্পত্তির ভাগ-বটরা নিয়ে ভাই-বোনেদের মারামারি এটির একটি উদাহরণ। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজেরই নিকটাত্মীয়দের আজকাল খুন-জখম করতেও পিছপা হয় না। বিষয়ের বিষে অনেক সংসারই ছারখার হয়ে যায়।

সংসারে বচসার অন্যতম কারণ ঈর্ষা। ভাই-বোনেদের মধ্যে ঈর্ষার বিভিন্ন কারণ থাকে – পরীক্ষার নম্বর থেকে শুরু করে খেলাধুলো বা গান-বাজনায় উৎকর্ষ, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, চাকরির মাইনে ইত্যাদি। তবে ভাই-বোনেদের থেকেও এসবে জ্বলুনি বেশী হয় বোধ হয় ননদের সঙ্গে ভাতৃবধূর, বা এক ভাতৃবধূর সঙ্গে আর এক ভাতৃবধূর। ঈর্ষার আগুনে মানুষ নিজেও পোড়ে, আর সংসারকেও পোড়ায়।

সংসারে বিবাদের আর একটি কারণ অসহিষ্ণুতা। উদাহরণস্বরূপ, শাশুড়ী-বউমার উভয়েরই স্বাভাবিক ইচ্ছা সংসারকে নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করা। শাশুড়ী মনে করেন - বউ তো অন্য বাড়ির মেয়ে – কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আর বউমা মনে করেন – আমি তো সংসার করতেই এসেছি, আপনার সংসার এতদিন আপনি আপনার মতো করে করেছেন, এখন আমার সংসার আমার মতো করে করতে দিলেই হয়, তাতে অযথা নাক না গলালেই হয়।

ভাতৃবধূদের মধ্যে বা শাশুড়ী-বউমার মধ্যে কলহকে বড় করে দেখিয়েছি বলে অনেকে আমাকে লিঙ্গবৈষম্যের দোষে দোষী করতে পারেন। কিন্তু ঘটনা হল – আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি মেয়েকেই তার নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়িতে গিয়ে ঘর করতে হয় বলে স্বাভাবিক ভাবেই এই উদাহরণগুলি উঠে আসে। যদি ছেলেদের শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতে হতো, তাহলে

ভগ্নীপতিদের মধ্যে বা স্বশুর-জামাইয়ের মধ্যে বিবাদের উদাহরণও নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে উঠে আসতো।

সংসারে অশান্তির কথা তো অনেক বললাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে এই অশান্তি কাটিয়ে শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে? প্রথমত, সংসারে অনেক ঝগড়াঝাঁটি এড়ানো যায়, যদি কোমর বেঁধে বাগযুদ্ধে নামার আগে নিজেকে অন্যের পরিস্থিতিতে রেখে একটু বিচার করা যায়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ই আমরা অন্যের কাজের পিছনে দুরভিসন্ধি আছে ধরে নিয়ে বিরূপ এবং অশোভন প্রতিক্রিয়া দেখাই। প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে যদি খোলামেলা আলোচনা করা যায়; মনের সন্দেহ, আশঙ্কা, অভিযোগ ব্যক্ত করে পরস্পরের কাছে নিজেদের কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে অনেক যুদ্ধ আটকানো যায়।

কিন্তু এসবের জন্য প্রয়োজন একটু ধৈর্যের, দরকার অশান্তি না করতে চাওয়ার মানসিকতা। প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে ধৈর্য বাড়ানো যায়, শান্তিপ্রিয়তা বাড়ানো যায়? এর জন্য শরীর এবং মন – দুয়েরই ঔষধ শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। শরীরের ঔষধ হলো নিরামিষ আহার। হাজার হাজার বছর আগে মুনিঋষিরা গবেষণা করে দেখেছেন যে আমিষ আহার করলে মানুষের ধৈর্য কমে যায় – ক্রোধ, ঈর্ষা এবং কলহপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, কথার পিঠে কথা চড়ানোর আবেগ প্রবল হয়। যার স্বাভাবিক পরিণতি সংসারে অশান্তি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল – হাজার হাজার বছর আগে আমাদের মুনিঋষিরা যা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা এখন সেই কথাকেই সমর্থন করছে। তাই মানুষের মন ও মস্তিষ্কের সুস্থতার ও সাম্যতার উপর নিরামিষ খাদ্যের প্রভাব বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রেও স্বীকৃতিলাভ করেছে।

মনের ওষুধ হল আধ্যাত্মিক চর্চা। প্রাচীন শাস্ত্রেও যেমন বলা আছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও তেমনি বলছেন – একটু জপ, একটু ধ্যান আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে সতেজ রাখে, আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন – সংসারে সবাই নিজে ভগবান সাজতে চায়, সেই জন্যই একের সঙ্গে অন্যের সঙ্ঘাত। পরিবর্তে সবাই যদি নিজেকে ভগবানের সেবক মনে করে, তাহলেই আর কোনও সঙ্ঘাত থাকে না। ঠিক যেমন সৌরমণ্ডলীর গ্রহরা যদি সবাই নিজের নিজের মতো করে পথ চলে, তাহলে সঙ্ঘাত অনিবার্য; কিন্তু সবাই যদি সূর্যকে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে, তাহলে কোনও সমস্যা হয় না। সংসারে ভগবান-কে মানতে হবে সূর্য, আর নিজেদের ভাবতে হবে গ্রহ, সূর্যের একই মাধ্যাকর্ষণ সবাইকে মেনে চলতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরো বলতেন – আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার সন্তান, আমার সম্পত্তি, আমার সংসার, আমার নিয়ম, এরকম না ভেবে আমরা যেন ভাবি কৃষ্ণের (ভগবানের) বাড়ি, কৃষ্ণের গাড়ি, কৃষ্ণের সন্তান, কৃষ্ণের সম্পত্তি, কৃষ্ণের সংসার, কৃষ্ণের নিয়ম, আর নিজেকে মনে করি তত্ত্বাবধায়ক (care-taker)। আমি এখানে শ্রীল প্রভুপাদের উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু যুগে যুগে সমস্ত ধর্মের সমস্ত মহাসাধকেরা বিভিন্নভাবে একই কথা বলে গেছেন। একজন প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক (care-taker) কিন্তু নিজের কাজে ফাঁকি দেন না, বরং তিনি এমন ভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন, যাতে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে তিনি বুঝি নিজের জিনিসই সামলাচ্ছেন। সংসারে থেকে

আমাদেরও অনুরূপ কর্তব্য পালন করতে হবে – বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংসারের নিত্য-নৈমিত্যিক কাজের বিশেষ পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তন হবে কেবল অন্তর্দৃষ্টির, পরিবর্তন হবে কাজের মনোভাবের। যেমন, বাজার বা রান্না করা আগের মতোই থাকবে, কিন্তু ভাবতে হবে এটা নিজের জন্য নয়, এসবই ভগবানের জন্য, আমরা নেব তাঁর প্রসাদ। পুরো বাড়িটাই ভগবানের মন্দির ধরে নিতে হবে, তাই এটাকে যথাযথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যত্ন নিতে হবে। সন্তান-পালন যেন ঈশ্বরপ্রেরিত আত্মার তত্ত্বাবধান, তাই তাকে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ফাঁকি দিলে চলবে না। সংসারে প্রত্যেকের মধ্যে যদি এই চেতনা জাগ্রত হয়, তাহলে ঘরে বসেই তীর্থভ্রমণের শান্তি পাওয়া যাবে।

পাঠকদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে – উপরে আলোচিত শরীর ও মনের এই ঔষধ কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু এই ঔষধ সেবন করা বড়ই কঠিন। আসল ব্যাপারটা হল, আমাদের এটা কঠিন মনে হওয়ার কারণ হল অনভ্যাস। সেই জন্য শাস্ত্রতেই নিদান দেওয়া আছে শিশু বয়স থেকেই নিরামিষ ভোজন এবং আধ্যাত্মিক চর্চা করতে হবে। বৈদিক যুগে প্রথম পঁচিশ বছর আধ্যাত্মিক চর্চার পিছনে এটাই যুক্তি ছিল – এতে যেমন ভবিষ্যৎ সাধুর মনে প্রকৃত ত্যাগ ও সেবার বীজ রোপিত হতো, তেমনি ভবিষ্যৎ গৃহস্থের মনে আদর্শ গৃহস্থ জীবনের শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যেত, সমাজে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকতো। তবে শৈশব থেকে আধ্যাত্মিক চর্চা হয়নি বলে বেশী বয়সে শুরু করা যাবে না, এমন অজুহাত কিন্তু ঠিক নয়। সদভ্যাস কখনই না করার থেকে দেরি করে করা ভালো।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না - এই বৈদিক আধ্যাত্মিকতা কোনও বিশেষ জাতি বা ধর্মের ব্যক্তিগত আচার-বিচার নয়, এটা ধর্মের নামে অধার্মিক ভেদাভেদ, হানাহানি, এবং কূপমণ্ডূকতার অনেক ঊর্ধ্বে। বৈদিক আধ্যাত্মিকতা মানুষকে নিজের খোলস থেকে উন্মুক্ত করে, মানুষকে বিশ্বমানব করে তোলে – যুগে যুগে তার প্রমাণ আমরা বার বার পেয়েছি। আধুনিক সভ্যতার অভিশাপে মৃতপ্রায় মানুষের নিজেকে বাঁচানোর তাগিদেই আজকে সময় এসেছে এই বৈদিক জীবনযাত্রা পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার।এতে সবাই সমানভাবে শিক্ষিত না হলেও, যেহেতু একহাতে তালি বাজে না, সেহেতু সংসারে অশান্তি অবশ্যই হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, গৃহে অশান্তির পরিমণ্ডল থেকেই বৃহত্তর সমাজে অন্যায়, অবিচার, অনাচার, অত্যাচার দানা বাঁধে। Charity begins at home – গৃহশান্তির সজপাঠ সমাজে, দেশে ও পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা নেবে বলে আমার বিশ্বাস।